

সংস্কৃতির টেকি

রিজিয়া রহমান

ফাঁপরে পড়েই পুরনো বন্ধুর শরণাপন্ন হলেন হেকমত আলী। বললেন—ভাই একটা বুদ্ধি দাও। দেখে-শুনে বিয়ে

করলাম নাইন পাস মেয়ে। ভেবেছিলাম আয়না-বায়নার ঝামেলা করবে না, মন দিয়ে করবে ঘর-গেরস্থালির কাজ। কিন্তু দুনিয়ার হাওয়াটাই এমন যে এখন অন্ধেরও চোখ খুলে যেতে দেরি হয় না। ব্যাপারটা ভাববারই মতো। হেকমত মধ্যম আয়ের নিচের সীমার চাকুরে। আঙুলে গুনে করতে হয় সংসার খরচ। দেশের বাড়িতে একগুণা পুষ্টি।

এদিকে তার এক বছরের আনকোরা গৃহিণী মফস্বলের লাজুকলতা আশা বেগম অনেক বড় বড় আশা করতে শুরু করেছে। আজ এটা চাই। কাল সেটা চাই। ভি.সি.আর-ভি.সি.ডি চাই, হালের গয়না চাই, চাই ফ্যাশনদুরন্ত শাড়ি জামা জুতো ব্যাগ প্রসাধনী। বউ’র বায়নার ত্রিসীমায় যাবার কথা ভাবলেও ভয়ে হেকমতের সব হেকমত কর্পূর হয়ে উড়ে যায়।

লাখ লাখ শর্ষেফুলের আমদানি হয়ে যায় চোখের সামনে। অনেক ভেবেচিন্তেই সমাধানের উপায়টা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের বুদ্ধি দিল বন্ধু।

বলল—বউকে সংস্কৃতি শেখাও।

তাতে ওসব শখের ভূত ছেড়ে যাবে।

তবে খবরদার—দেশি সংস্কৃতি ছাড়া আর কিছুতে নাক গলাতে দিযো না।

ফ্যাকাশে মুখে ঢোক গিললেন হেকমত আলী—কিন্তু ভাই ওসবে যে অনেক খরচ। —আরে দূর। দেশি সংস্কৃতিতে খুব কম খরচ। পয়সা ফেলতে হয় তো অপসংস্কৃতির বেলায়। এক কাজ করো। বউকে বইয়ের নেশা ধরিয়ে দাও। ব্যস দুদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। দোদুল্যমান সংশয় নিয়ে বিদায় নিলেন হেকমত। কিন্তু ফল হলো চমৎকার।

হেকমতের বউ আশা এখন অসাধ্য সাধ্যের দুরাশা ছেড়ে মন দিয়েছে পাঠে। কিন্তু ক’দিন পরেই ব্যাজার মুখে হেকমত এসে হাজির। আবার বিপত্তি দেখা দিয়েছে। আশা বেগম দিনরাত গোয়াসে গিলছেন রাজ্যের গল্প-উপন্যাস। সংসারের কাজে মন নেই। রোজই ভাত পুড়ে যায়, তরকারিতে নুন হয় না। মাছ নিয়ে যায় বেড়ালে। এর ওপর রয়েছে বই জোগানোর সমস্যা।

নতুন বই কেনা না হলে আশা প্রচণ্ড নিরাশ হয়ে বিছানায় পড়ে যায়। খায় না, নায় না। চোখ মেলে চায় না। বাধ্য হয়ে ধার-কর্জ করে কিনে আনতে হয় নতুন বই। তার ওপর দেখা দিয়েছে এক নতুন উপসর্গ। গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মতো প্রায়ই ঘুরে বেড়াবার বায়না ধরছে নদীর ধারে, রাত দুপুরে প্রচণ্ড শীতে জ্যোৎস্না দেখবার শখ করছে ছাদে উঠে। যখন তখনই বলছে—সমুদ্রে যাব।

পাহাড় দেখব। আর মুখ ভার করে স্বামীকে দোষারোপ করছে—তুমি তো বইয়ের নায়কদের মতো সুন্দর করে কথা বলো না আমার সঙ্গে। বন্ধু এবার বললেন—এক কাজ করো, কিছু কউর প্রবন্ধের বই কিনে দাও। আজকাল সবকিছুতেই ভেজাল। প্রবন্ধে ভেজাল কিছুটা কম। হজম হবে সহজে। এক বান্ধিল প্রবন্ধের বই জোগাড় করে আশা বেগমের হাতে তুলে দিয়ে বড় আশা নিয়েই বললেন হেকমত—নাও এবার কালচার সম্পর্কে কিছু জ্ঞান বাড়াও।

বইগুলো উলটে-পালটে নিরাশ হয়ে আশা বেগম ভুরু তুলে প্রশ্ন করল—সেটা আবার কত নম্বর অপকর্ম? চমকে গেলেন হেকমত আলী। বইপত্র পড়ে পড়ে কি মাথাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল না কি তার সুন্দরী বউয়ের। বললেন—অপকর্ম কেন হতে যাবে।

এ তো কালচার! আশা বেগম বিজ্ঞভাবে জানিয়ে দিল—গল্প-উপন্যাসে ‘চার’ দিয়ে যত শব্দ পাচ্ছি সেগুলো সবই তো খারাপ কাজ।

যেমন অবিচার, অত্যাচার, অনাচার—বউয়ের জ্ঞানের বহরে অবাক হলেন হেকমত। বললেন—ওই আচার আর এই আচার মোটেই এক নয়। একেবারেই আলাদা। এ হলো গিয়ে কালচার। অর্থাৎ সংস্কৃতি। এরপর নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার ঝেড়েমুছে কালচারের ওপর নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়ে বসলেন হেকমত আলী। ওষুধ ধরে গেল। আশা বেগম দিনরাত প্রবন্ধের বইতে মনোনিবেশ করে সংস্কৃতিবিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে শুরু করল। তারপর হঠাৎ একদিন পাড়ার মহিলা সমিতির সংস্কৃতি সচিব হয়ে বসল। হেকমত আলী মহাখুশি।

সংস্কৃতিচর্চা করে আশা বেগমের জ্ঞানগম্য যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে সামাজিক পরিচিতি। আশা বেগম এক প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে খাতিরের সুবাদে হেকমত আলীর চাকরিতে প্রমোশন পর্যন্ত ঘটিয়ে ফেলল। ভাগ্যিস হেকমত আলীর বন্ধু সংস্কৃতির পথটা চিনিয়েছিল। তার বদৌলতেই হেকমত আলী সংস্কৃতিবতী স্ত্রীকে নিয়ে নতুন বাড়িতে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসতে পারলেন। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল আবার। পয়লা বৈশাখের সকালে গরমভাবে পানি ঢেলে ভাজা শুঁটকি মাছ কাঁচা মরিচসহ নাশতার টেবিলে পরিবেশন করল আশা বেগম।

যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বলল—ভুলে যেয়ো না আমরা বাঙালি।

পাল্লাভাত আমাদের ঐতিহ্য।

অনভ্যস্ত অভ্যাসটি সংস্কৃতির খাতারে মেনে নিলেন হেকমত আলী।

যাই হোক সংস্কৃতিচর্চার কারণেই তো হেকমত আলীর কপালে সুখ এসেছে।

কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হলো না তার সুখের কপাল। বাড়ি থেকে কার্ঠের চেয়ার-টেবিল সোফা উধাও হলো। তার বদলে এল পিঁড়ি আর পাটি। এরপর বিদায় হলো অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি-পাতিল। রান্না শুরু হলো মাটির হাঁড়িতে মাটির চুলোয়।

চীনা মাটির প্লেট আর কাচের গ্লাসের বদলে মাটির খালাবাসন চালু করা যায় কি না এ সম্পর্কেও ভাবনা-চিন্তা শুরু করলেন আশা বেগম। হেকমত আলী শঙ্কিত হয়ে বাতিল তৈজসপত্রের পক্ষে ওকালতি করতে চেষ্টা করলেন—এসব নিয়ে কি আর সংস্কৃতিচর্চা হয় না?

এরা তো তোমার সংস্কৃতির কোনো ক্ষতি করেনি।

আশা বেগম ডায়াসের প্রধান বক্তার মতো জানিয়ে দিল—এসব হচ্ছে অপসংস্কৃতি।

এগুলোর আমদানির মারফতই তো দেশজ শিল্প-সংস্কৃতি ধ্বংস হচ্ছে।

হেকমত আলী প্রমাদ শুনলেন।

না গুনেই বা উপায় কী। এদিকে সংস্কৃতির বাহন শিকা, কুলো-ডালা, ঘটি-বাটিতে ঘর ভরে তুলেছে আশা বেগম। পদে পদে হোঁচট খেতে হয়। কিন্তু এতেই তো আর আশা বেগমের সংস্কৃতি গবেষণা নিরস্ত হতে পারে না। সংস্কৃতি-সভার নেতৃত্ব দিয়ে আশা বেগম বাড়ি ফিরেই ঘোষণা করে বসল—এবার একটা ঢেঁকি দরকার।

হেকমত আলী একেবারে হাঁ হয়ে গেলেন—ঢেঁকি দিয়ে কী হবে শহরের এই তিনতলা ফ্ল্যাটবাড়িতে?

এ কি আর গাঁয়ের বাড়ি যে মণকে মণ ধান আসছে ক্ষেত থেকে।

আর বাড়ির গিল্লি লোক দিয়ে ধান ভানাচ্ছে।

বিরক্ত হলো আশা বেগম—কী যে বলো।

লোক দিয়ে কী হবে।

টেকি আমি নিজেই ভানব।

চোখ কপালে উঠে গেল হেকমত আলীর।

কী সাংঘাতিক কথা। বলা তো যায় না।

সংস্কৃতি নিয়ে যেমন ক্ষেপেছে আশা বেগম তাতে তিনতলায় একটা টেকি চড়িয়ে—‘ও ধান ভানিরে’, গাইতে গাইতে টেকি ভানতে শুরু করা অসম্ভব কিছু নয়। স্ত্রীকে বুঝ দেবার চেষ্টায় হেকমত নরম হলেন—কী যে সব পাগলামির কথা বলো! তুমি ভানবে টেকি এ কখনো হতে পারে? সংস্কৃতি ভাবনায় একাগ্র আশা নিজের মতো অবিচল—পাগলামি কেন হতে যাবে। এ তো আর যে সে টেকি নয়। কালচারের টেকি। আগে টেকিটা আসুক তখন দেখবে।

এতদিন পরে রাগে-দুঃখে নিজের মাথাটাই টেকিতে কুটতে ইচ্ছে হলো হেকমত আলীর। কোন দুঃখে যে বন্ধুর কথামতো খাল কেটে এই কুমির ঘরে এনেছিলেন তিনি। এর চেয়ে শাড়ি-গয়নার বায়না যে অনেক নিরাপদ ছিল, আশা বেগমের টেকির চিন্তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টাতে টেকি অবতারণার নানা কুফল তুলে ধরলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বললেন—দ্যাখো টেকি জিনিসটা নেহাতই ছোটলোকি জিনিস। আশা বেগম মাথা নাড়ল—ওসব সামন্তবাদী কথার দিন শেষ। হেকমত আলীও হাল ছাড়তে নারাজ।

নতুন যুক্তির অবতারণা করে ফেললেন—তুমি তো ইদানীং মেলা বইপত্র পড়ছ। জানো তো টেকি কথাটা খুব ভুঙ্কার্থে ব্যবহার করা হয়। বলা যায় এক ধরনের গাল-মন্দ। এই যেমন ধরো—তোমাকে যদি এখন বলি যে তুমি একটা বুদ্ধির টেকি। তাহলে নিশ্চয়ই তুমি রেগে উঠবে।

আশা বেগম প্রসন্ন হাসিতে উৎফুল্ল হলো—এসব ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিকে উৎখাত করব বলেই তো টেকিকে ঘরে তুলতে চাচ্ছি। টেকিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা না দিতে পারলে আমাদের সংস্কৃতির কোনো উল্লতিই হবে না। ‘টেকি’ বিষয় নিয়ে জরুরি সভায় যোগ দেবার জন্য বাড়ি থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল আশা বেগম। যাবার সময় বলে গেল—বাংলা বাগধারা থেকে ‘টেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে’ এ কথাটা তুলে দেবার জন্যই আমরা শিগগিরই আন্দোলন শুরু করব।

ত্বীকে মনে মনে অকর্মার টেঁকি গাল দিতে দিতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন হেকমত আলী। দুদিন পরে অফিস থেকে ফিরেই দেখলেন ঠেলাগাড়ি থেকে বিরাট এক টেঁকি নামছে তাঁর বাড়িতে। হেকমত আলীকে দেখে আশা বেগম খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল—ওগো, আর চিন্তা নেই। টেঁকি এসে গেছে। আমকাঠের টেঁকির বেতপ শরীরকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকবার পথ খুঁজতে খুঁজতে হেকমত পুরনো মেজাজে বললেন—একেবারে আত্মাদের টেঁকি। কটুবাক্য আশা বেগমের কর্ণ গোচর হলো না। সে এখন টেঁকি নিয়ে মহাব্যস্ত। অনেক ভাবনা-চিন্তা জল্পনা-পরিকল্পনার পর টেঁকিকে বসানো হলো ড্রইংরুমে। আশা বেগমের জোরালো যুক্তিও রয়েছে এর সপক্ষে। ডালা, কুলো, সরিষা, ঘটি, পাটি দিয়ে যদি বসার ঘর সাজানো যায়, তাহলে টেঁকিই বা কী দোষ করল।

তাছাড়া টেঁকিকে তো তার যোগ্য সম্মানও দিতে হয়। বহুদিন ধান ভানা শ্রমিকের কাজ করে অনাদরে টেঁকির ঘরে পড়ে থেকে বহু বঞ্চিত হয়েছে। বেচারি অতি প্রাচীন অবহেলিত ঐতিহ্যের টেঁকি। আশা বেগমের এখন দম ফেলবার অবসর নেই। অপ্রচলিত ঐতিহ্যকে প্রচলিত করবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব তার ওপরে। আবহমানকালের টেঁকিকে নিয়ে তৈরি করে ফেলল টেঁকি কমিটি। আর টেঁকি কমিটির সভানেত্রী হয়ে উঠে পড়ে লেগে গেল টেঁকির প্রচারে। টেঁকির ওপর সেমিনার, টেঁকি প্রদর্শনী, টেঁকিভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে। আশা বেগম যেন জীবনটাকে টেঁকির নিচে উৎসর্গ করবার ব্রত গ্রহণ করে ফেলল। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে ঢুকতে বেগ পেতে হলো হেকমত আলীকে। বাড়িটা একটা জাদুঘর হয়ে গেছে। একদঙ্গল ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে টেঁকি চেনাচ্ছে আশা বেগম। হেকমত আলীকে দেখে পরম খেদে বলল—দ্যাখো কাণ্ড! এ দেশের ছেলেমেয়েরা টেঁকি চেনে না। কী লজ্জার কথা! আমাদের অতীত জীবনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টেঁকি কত বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

টেঁকি কমিটির সদস্য-সদস্যদের উদ্দেশে সুচিন্তিত সুপারিশ দিয়ে ফেলল আশা বেগম—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে আমাদের দাবি পাঠাতে হবে যে এখন থেকে টেঁকিকে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হোক। হেকমত আলী দুর্বল প্রতিবাদ তুললেন একটু—কিন্তু একসময় গ্রামের ডাকাতরা যে টেঁকি নিয়ে গেরস্থের দরজা ভাঙত এটা প্রচার হলে যে সমাজবিরোধীরা অনুপ্রেরণা পেয়ে যাবে।

মহা খাপ্পা হলো আশা বেগম—তুমি খামো তো। এ টেঁকি কি আর সে টেঁকি! এ তো সংস্কৃতির টেঁকি। শুনুনো মুখে বাড়ি ছেড়ে পার্কে গিয়ে বসলেন হেকমত।

টেকি-সমস্যার হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় না পেয়ে মাঝরাত অবধি পার্কেই বসে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত ছিনতাইকারীর হাতে হাতঘড়ি আর মানিব্যাগ তুলে দিয়ে শুধুমাত্র প্রাণটা বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এবারও বাড়িতে ঢোকা গেল না।

অকর্মা টেকি বাড়িটাকে সম্পূর্ণ টেকিশালা বানিয়ে বসে আছে।

টেকিকে নিয়ে চলছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঢোল, বাঁশি, কাসি সহযোগে টেকি ভানার গান আর নাচে বাড়ি প্রকল্পিত। বাকি রাতটুকু সিঁড়ির ওপর কাটিয়ে হেকমত আলী এলেন বন্ধুর কাছে। প্রায় কেঁদেই ফেললেন—ভাই আমাকে এবার টেকির হাত থেকে বাঁচাও। টেকি আমার জীবনের সুখ-শান্তি কুটে ছাত্তু করে দিচ্ছে। বন্ধু এবার নতুন বুদ্ধি বাতলে দিল।

বলল—তোমার বউকে বইয়ের মেলায় নিয়ে যাও।

আঁতকে উঠলেন হেকমত—আবার বই!

বইয়ের হাত ধরেই তো টেকি এসে উঠেছে ঘরে।

আবার বইয়ের পিছে ছুটলে নির্ধাৎ হাজারমণি একটা ধানের নৌকাই এসে উঠে বসবে বাড়ির ছাদে।

বন্ধু বিপ্তের হাসি হাসল—আরে এ বই সে বই না। আমাদের বইমেলায় দেশি প্রকাশকরা বিদেশি বই ছাপিয়ে দেশি সংস্কৃতির কভার লাগিয়ে বেদম বিক্রি করছে। সেই বইয়ের নেশাটা যদি একবার আশা বেগমকে ধরিয়ে দিতে পারো, তাহলে তোমার এই সাংস্কৃতিক টেকি পালাবার পথ পাবে না। নতুন বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত হয়ে টেকির মাথায় আদরের হাত বুলিয়ে হেকমত প্রস্তাব পাড়লেন আশা বেগমের কাছে—বুঝলে এটা হচ্ছে সংস্কৃতির মাস।

এখন টেকিটাকে ঘরে বন্ধ না রেখে, জনসমাগমের মাঝখানে বসানো উচিত। টেকি তো মুষ্টিমেয় মানুষের নয়। এ তো গণসংস্কৃতিরই বাহন। টেকিকে কি তাহলে চার রাস্তার মোড়ে বসাব? আশা বেগম উৎসাহিত হয়ে বলল। কিন্তু তার এই কাঁচা প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিলেন হেকমত আলী। —মাথা খারাপ। দেশের ট্রাকের দঙ্গল এমন নতুন জিনিসের সঙ্গে অ্যাকসিডেন্ট করবার জন্য যে তাহলে ম্যারাথন রেস দিয়ে ছুটে আসবে। তখন টেকি পাবে কোথায়? চিন্তিত আশা বেগমকে পথপ্রদর্শন করলেন হেকমত—এক কাজ করো টেকিকে নিয়ে বসিয়ে দাও বইমেলায়।

এমন চমৎকার উদ্ভাবনী বুদ্ধির জন্য টেকি কমিটির সদস্য-সদস্যরা হেকমত আলীকে টেকি-স্মৃতি স্বর্ণপদক দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে দেরি করল না। কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন হেকমত আলীর। আকাঠের টেকি এবারও তাকে জন্দ করতে

কসুর করল না। বিদেশি বইয়ের সপক্ষে না গিয়ে বিপক্ষে চলে গেল আশা বেগম। টেকির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদী বক্তৃতা দিয়ে ফেলল। বক্তৃতা শুনে হেকমত আলী পর্যন্ত চমকে গেলেন। এসব কী বলছে তার নাইন-পাস মফস্বলি স্ত্রী আশা বেগম। এ যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ। আশা জোর গলায় বিদেশি বইয়ের নিন্দা করল।

আমাদের নাজুক সংস্কৃতিকে রসাতলে পাঠাবার জন্য সংস্কৃতির মাসে, সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা বিদেশি সংস্কৃতির দ্বারোদ্ঘাটন করছে তাদের জাতীয় শত্রু বলে গালমন্দ করল। উদাত্ত ভাষায় প্রশ্ন করল—আমরা জানতে চাই কার অনুমতিক্রমে এবং কোন আইনে এসব বই এ দেশে আমদানি হচ্ছে বা প্রকাশিত হচ্ছে। বড়ই দুঃখ প্রকাশ করে বলল আশা বেগম—আমরা যখন এত ঢাকঢোল পিটিয়ে বই নিয়ে করছি হইচই—টেকিকে স্থাপন করছি সংস্কৃতি অঙ্গনে তখন দেশি বইকে অঙ্কুরে বিনাশ করবার এই কারচুপি কেন! শুধু তাই-ই নয়, বিদেশি বইয়ের বাজার তৈরি করবার এই অপচেষ্টা নিঃসন্দেহে আত্মঘাতী। এর প্রভাবে দেশীয় সংস্কৃতি লোপাট হয়ে যাবে। আর টেকিকে আবার ফিরে যেতে হবে অগৌরবের টেকিঘরে। দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাল আশা বেগম—আসুন আমরা সবাই মিলে এই অপচেষ্টা বন্ধ করে আমাদের আবহমানের সংস্কৃতির বাহন টেকিকে বাঁচিয়ে রাখি।

হেকমত আলী প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে বন্ধুকে পাকড়াও করলেন—তোমাকেই এবার টেকিতে কোটা উচিত। কৌশল করে তুমি টেকিকেই জিতিয়ে দিচ্ছ। বন্ধু হেকমতকে নতুন বুদ্ধি বাতলে দিল—যাও এবার বউকে বলো বিদেশি বই হাইজ্যাক করতে। দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। শেষবারের মতো বন্ধুর পরামর্শটা কাজে লাগালেন হেকমত আলী—বিদেশি বইগুলো সব হাইজ্যাক করা হোক। সেটাই হবে সাংস্কৃতিক মাসের উপযুক্ত সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ।

এমন প্রস্তাবে চমৎকৃত আশা বেগম লাফিয়ে নেমে পড়ল টেকির ডায়াস থেকে। সদলবলে চড়াও হলো বিদেশি লেখকের বইয়ের ওপর। ট্রাক বোঝাই অন্য সংস্কৃতির বই এনে ডাম্প করা হলো হেকমত আলীর বাড়িতে। তারপরই সুফল দেখা দিল। টেকি কমিটির সভানেত্রী আশা বেগম টেকির কথা বেমালুম ভুলে গেল। রাতদিন হাইজ্যাক করা বিদেশি বইয়ের রাজ্যে বিভোর হয়ে রইল।

যেন আলাদিনের জাদুর চেরাগ এসে গেছে ঘরে, টেকির ওপর বুক ডন দিতে শুরু করল ইঁদুর আরশোলা। হেকমত আলীর বন্ধু বলল—এবার অকর্মা টেকিটাকে বিড়াল পার করে দাও। হেকমত আলী মাথা দোলালেন—ব্যাটা অনেক জ্বালিয়েছে,

এবার ওকে একটু খাটিয়ে নিতে হবে। বাড়িতে অনেক সংস্কৃতির গ্যাঞ্জাম জমেছে ওগুলোকে টেঁকিতে কুটে ছাতু করতে হবে।

আশা বেগমের পাতা নেই। বইয়ের পর বই পড়ে চলেছে সে। এদিকে হেকমত আলী মহা আনন্দে দেশি সংস্কৃতিকে টেঁকিতে কুটে ধ্বংস করতে করতে বাহবা দিলেন বিদেশি বইকে—ভাগ্যিস এগুলো ছিল, তা নইলে এত সহজে কি দেশজ সংস্কৃতিকে ঘায়েল করা যেত। যাক সব চুলোয়। আপাতত শুধু টেঁকিটাই থাক। টেঁকি দিয়েই ভবিষ্যতে হয়তো চর্চা করা যাবে নতুন

টেঁকি-সংস্কৃতির। **সমাপ্ত**